প
রি
ক্র
মা

‘কিং বর্ণয়াম’

ভারতবর্ষের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক কিন্তু আশ্চর্য মাতৃময়তায় জারিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ছাত্রসমাবর্তনে ঋষি বলেছিলেন, ‘‘মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব।’’—মাতা তোমার দেবতা হোন, দেবতা হোন পিতা। ছিন্নবন্ধন আচার্যের কণ্ঠে পিতার আগে উচ্চারিত হয়েছে মাতার কথা। স্মৃতিশাস্ত্রেরও দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত : ‘‘পিতুরপ্যধিকা মাতা’’—পিতার চেয়েও মাতা অধিক। অতএব দেবতা ও মানব দুই পক্ষেই মায়ের গৌরব বেশি প্রতিপন্ন হল। শিশু একান্তভাবে মাতৃনির্ভর। সে জানে মা সব জানেন, সব পারেন। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রমশ বুঝতে পারে যে তিনি তা নন। অথচ অন্তরের সেই পরম নির্ভরতার আধার একটি পরম আশ্রয় তার প্রয়োজন হয়। যুগে যুগে তাই মানুষ—শুধু মানুষ কেন, বিপন্ন হলে দেবতারাও—এমন একটি আশ্রয় চেয়েছেন এবং পেয়েছেন, যে-আশ্রয় সত্যিই সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার আভরণে ভূষিত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ওই সর্বনিয়ন্ত্রী শক্তিরই অদ্ভুত প্রকাশ দেখে অন্তর আনত হয়ে আসে।

অথচ এযুগের দেবীর মহিমাপ্রকাশে দেখি আশ্চর্য সংযম। সমাগতজনের চোখে চরণটুকুই মাত্র দৃশ্য তাঁর। লজ্জাপটাবৃতা তিনি, মৃদুতাই তাঁর পরম শক্তি। আপাতদৃষ্টিতে অতিসাধারণ এই পল্লিবালার মাহাত্ম্য প্রচার করে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং, এবং তাঁর পার্ষদেরা। তাঁকে কেউ বলেছেন সরস্বতী, কেউ বলেছেন জ্যান্ত দুর্গা, কেউ বলেছেন কালী-তারা প্রভৃতি আদ্যাশক্তির অংশ-প্রকাশ। দুর্গাপূজার পর শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণা পাঠিয়ে শরৎ মহারাজ বলেছিলেন, ‘‘এখানে তো তাঁরই পূজা হল।’’ মা স্বয়ং বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন তিনি লক্ষ্মী, কালী, সীতা, রাধা।

প্রশ্ন জাগে, একই সত্তাকে এইসব বিভিন্ন নামে অভিহিত করা কেন? সমস্ত দেবীশক্তি পরমার্থত অভিন্ন বলেই কি? না, তা নয়। বিভিন্ন দেবী এক পরাশক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ, ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি। শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ষোড়শীরূপে পূজা করেছিলেন। দেবী ষোড়শীর মন্ত্র ‘ত্রিকূট’—তিনটি অংশের সমাহার : ‘বাগ্‌ভবকূট’ যা জ্ঞানকে প্রকাশ করে, যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী; ‘কামরাজকূট’ যা ইচ্ছার প্রকাশক, যার অধিষ্ঠাত্রী কালী; এবং ‘শক্তিকূট’ যা ক্রিয়াপ্রকাশক, যার অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা বা বগলা। এই দেবীরা সকলেই ত্রিকূট মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষোড়শীর বিভূতি বা অংশ। যেহেতু শ্রীশ্রীমা দেবী ষোড়শীর মানববিগ্রহ, তাই তাঁর বিভিন্ন লীলার সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে সরস্বতী, কালী, দুর্গা, বগলা প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করা চলে।

মায়ের স্বরূপকে সীমায়িত করা যায় না। প্রতি পলে তিনি আত্ম-উন্মোচন করে চলেছেন, যে তাঁকে একাগ্রমনে স্মরণ করছে তার কাছে। এযুগের আর এক ঋষি, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বামী নির্বাণানন্দ, ‘‘আমাদের মা-ই তো দুর্গা’’—জনৈক ব্রহ্মচারীর মুখে একথা শুনে নিজের উপলব্ধি ঘোষণা করেছিলেন মাত্র দুটি শব্দে : ‘‘তফাত আছে।’’

হ্যাঁ, তফাত আছে বই কী! মহিষাসুরমর্দিনীর মতো হাজার হাতে হাজার অস্ত্র কই মায়ের! বিশাল পর্বতের মতো আকাশছোঁয়া রূপ কই, জ্বলন্ত অগ্নির মতো তেজ? কোথায় সেই আপূরিতনভ অট্টহাসি? গর্জে গর্জে মধুপান? হয়তো এতসব ঐশ্বর্য ছিল

বলেই, মহিষাসুরবধের পর দেবীস্তুতি করতে গিয়ে দেবতারা অশেষপ্রকারে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেও সসম্ভ্রম একটি দূরত্ব বজায় রেখেছেন—দেবী, ভগবতী, পরমা প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বোধনে। দীর্ঘ স্তুতিতে মাতৃসম্বোধন করতে দেখি একবারই—একেবারে শেষে। প্রথমেও একবার 'অম্বিকা' শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে তাঁরা—কিন্তু তা বিশেষণ হিসেবেই—সম্বোধন হিসেবে নয়। আসলে অপ্রাকৃত রূপগুণের অধিকারিণী দেবীরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্ভ্রমেরই পাত্রী হতে পারেন, ঘরের মা-টির মতো আদর-আবদার চলে না তাঁদের কাছে। এই অপূর্ণতা দূর করতেই বিশ্বজননীর এবার গৃহজননী হয়ে আসা—'মানবীয় আধারে মানবীর আকারে নিখিল মায়ের মমতা, ধৈর্য ও আকুলতা' নিয়ে। বিন্দুর আকারে সিন্ধু—কত আপন, কত মধুর!

তাই তাঁর প্রয়োজন নেই 'অজর অম্বর'। 'অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা'র শক্তি ঢাকা একটিমাত্র আটপৌরে শুভ্রবস্ত্রে। অপার মহিমা তবু কখনও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে চকিতে, অজান্তে : ''বিধির সাধ্য নেই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।'' সাধ্য কেমন করে থাকবে? তাঁর সন্তানদের যে, তাঁরই ভাষায় : 'মুক্তি হয়ে আছে'! হবেই তো! তিনি যে-স্নেহের বাঁধনে বেঁধেছেন—'স্নেহেন বধ্নাসি', যে-স্নেহ প্রেমস্বরূপার অনন্ত প্রেমপ্রবাহে যুক্ত, সে-যুক্তি মুক্তি ভিন্ন আর কী! অসুরদের মরণোত্তর শুভগতি দিতে দেবী দুর্গা অস্ত্রাঘাত করেছেন, 'সমরনিষ্ঠুরতা'র অন্তরালে তাঁর 'চিত্তে কৃপা'। শ্রীশ্রীমায়ের সমর ছিল, নিষ্ঠুরতা ছিল না। তাঁর সমরাস্ত্র অভিনব—সে তাঁর প্রেম। সে তাঁর মৃদুতাও। 'নাসেব্যং মৃদুণা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীক্ষ্ণতরো মৃদুঃ'—সকলেই মৃদুতার বশ, তাই এ-অস্ত্রই তীক্ষ্ণতর; আর এ-অস্ত্রই মায়ের পাশুপত, পশুপতি যাকে প্রণাম-অস্ত্রে রূপ দিয়েছিলেন। মানবমনের ক্রোধ-লোভ-মোহের অসুরকে মা ধ্বস্ত করেছেন অবিরত। বাসনা আছে বলেই দেহধারণ ও বিচিত্র কর্মজাল, সঙ্গে কর্মজাত সংস্কার—জন্মজন্মান্তরীণ। সংস্কারই কর্ম করায়। তাই মা বলতেন, ''নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুনি হয়।'' তাঁর সন্তানদের 'মুক্তি হয়ে থাকা'র অর্থ, শরীরত্যাগের আগে তাদের 'নির্বাসনা' করে নেবেন তিনিই। বাসনা থেকেই ষড়রিপু—অতএব বাসনার নাশই রিপুধ্বংস। মানুষের শক্তিতে এ অসম্ভব বলেই মনে হয়। পুরাণে মহিষাসুর-শুম্ভ-নিশুম্ভের কার্যকলাপ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় তারা ষড়রিপুর ঘনীভূত মূর্তি। তাদের অমিত বল ত্রিলোকের ত্রাস। তাদের ধ্বংসের জন্য ভগবতীর লোকপ্রসিদ্ধ মহারণ।

এযুগে ভগবতী স্নেহঝরা কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : তাঁর সন্তান ধুলোকাদা মাখলে তাঁকেই ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। বাসনা-কামনা-রিপুর ধুলোকাদা—যা ধরণীর বুকের অনিবার্য 'মলামাটি'—তা তিনি নিজেই ঝেড়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। স্নেহবিগলিত, শাসন-অক্ষম পার্থিব জননীর মতো তিনি বলতেন, ''আমি কারও কিছু খারাপ দেখতে পাইনে, তা শাসন করব কি? আমি যে মা! আমি শাসন করব কী করে? আমি ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার-ঝরিষ্কার করে নিই।''

তাঁর ভালবাসার স্পর্শেই মানুষের মনের কামক্রোধাদির অসুর বিনষ্ট হয়ে যেত। স্বামীজীর দৃষ্টির সামনে নিজেকে লুকোতে পারেননি মা। আর্ষদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল তাঁর অতিপ্রাকৃত ঐশী রূপ : ''তিনি বগলার অবতার—সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।... উপরে মহাশান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি। সরস্বতী অতি শান্ত কিনা!'' দেবী বগলাকে দেখা যায় হাত দিয়ে অসুরের জিভ টেনে ধরে তাকে কঠোরভাবে দমন করতে। মায়ের জীবনে একবারমাত্র এই ব্যাপারের আক্ষরিক লীলা-অভিনয় দেখা গিয়েছে—হরিশের ঘটনায়। এত মৃদু, এত শান্ত, এত স্নিগ্ধ-করুণ মাতৃমূর্তির

সংহারিণী রূপ কেমন করে স্বামীজীর চোখে ধরা পড়েছিল? মনে হয় ওই আন্তর-অসুর নিধনের জন্যই। নিষ্ঠুর পীড়ন করে নয়, পরম স্নেহে অঙ্কে টেনে মা মানবমনের মহাবল আসুরী সংস্কারকে দলিত মথিত করেছেন। তাঁর মুখের 'এসো বোসো খাও'—এই ত্রিমন্ত্রই ত্রিফলা ত্রিশূল হয়ে সন্তানের শত শত জন্মের সংস্কাররূপ অসুর ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার কাছে 'এসো'—অর্থাৎ সংসারের মহাঘূর্ণিপাক ছেড়ে 'মামেকং শরণং ব্রজ'—জগজ্জননীর অভয়ক্রোড়ে ফিরে এসো। আমার কাছে 'বোসো'—সংসারের অনলকুণ্ড থেকে একবার বেরিয়েছ যখন, তখন মাতৃসকাশেই অবস্থান করো—ঝলসে-যাওয়া পুড়ে-যাওয়া ক্ষতগুলি নিরাময় করো। 'খাও'—পার্থিব আহারই জগন্মাতার স্পর্শে অমৃতময় হয়ে যায়, তা গ্রহণ করো; সঙ্গে তাঁর অপার্থিব স্নেহ-আশীর্বাদও মাথা পেতে নাও যাতে মরজগতের ক্ষুধাতৃষ্ণা চিরতরে মিটে যায়—বাসনাহীন জীবাত্মাকে আর নতুন শরীর পরিগ্রহ করতে না হয়। 'ত্রিশূলং পাতু নো ভীতেঃ'—দেবতারা আর্তি জানিয়েছিলেন—''তোমার ত্রিশূল আমাদের ভয় থেকে রক্ষা করুক।'' এযুগে সন্তানের মুখ থেকে প্রার্থনা নিঃসৃত হওয়ার আগেই জননী প্রস্তুত রেখেছেন ওই 'এসো বসো খাও'-রূপী ত্রিশূল, যা ভবক্ষুধা—দেহের ও মনের—ধ্বংস করে সন্তানের ভববন্ধন মোচন করে দেয়। এত মসৃণভাবে, প্রতিরোধহীনভাবে অন্তরের প্রবলপ্রতাপান্বিত দানব ধ্বস্ত হয়ে যায় যে, বোঝাই যায় না একটা কিছু ঘটল। তাই একালের কবি গেয়েছেন অসুরনাশিনীর নবরূপের বন্দনা :

''অসুরে আর নাশো না মা,
আদরে দাও কোল—
মা তোমার বদলে গেছে ভোল্।''

এ অপরূপ, অভূতপূর্ব মাতৃমূর্তির সামনে আমরা স্তব্ধ। ভগিনী নিবেদিতার মতো মনে হয়, কোনও শব্দই তাঁর মহিমা প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মহিষমর্দিনীকে দেবতারা বলেছিলেন, ''তোমার অচিন্ত্য রূপ, বীর্য, রণপরাক্রম—এতকিছু আমরা 'কিং বর্ণয়াম'—কী করে বর্ণনা করব?'' জননী! তোমার কথা ভাবতে গেলে আমাদেরও কলম থেমে যায়; অন্তর জুড়ে ধ্বনিত হয় ওই দুটি শব্দ : 'কিং বর্ণয়াম।'

মা! কল্যাণ—শুধুই কল্যাণ ক্ষরিত হচ্ছে তোমার নয়ন থেকে। স্পর্শ করছে আমাদের সমগ্র সত্তা। ধুয়ে দিচ্ছে জীবনের যত ধুলোকাদা, অন্তরের অসুর ধ্বংস করে পূর্ণ করে দিচ্ছে অমৃতে। মা, আমাদের জীবনে এনে দাও প্রজ্ঞাসূর্যের অস্তহীন উদয়।

আশ্বিনের শারদপ্রাতে আবার আলোর বেণু বাজবে। মানবপ্রকৃতি আর বিশ্বপ্রকৃতি ব্যাপ্ত করে আজ অশুভ শক্তির নিষ্ঠুর, ভয়ংকর উল্লাসনৃত্য। এই বিশ্বজোড়া মহাসংকটে আমরা জগজ্জননীর প্রসন্নতা প্রার্থনা করি। জানি, 'মৃত্যু-অমৃত দুয়ে তব কৃপা ঝরে গো', তবু বিপন্ন মানবসত্তার দুঃখমুক্তির জন্য করুণার্দ্রচিত্তা মহামায়ার কাছে সকরুণ কাতর প্রার্থনা জানাই।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে লেখক, পাঠক, গ্রাহক, মুদ্রক, বিজ্ঞাপনদাতা, কর্মী, পৃষ্ঠপোষক, স্বেচ্ছাসেবক, শুভানুধ্যায়ী—সকলকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। জগজ্জননী সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন, এই প্রার্থনা।

—সম্পাদিকা